আমার মন

অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঃ

কমলাকান্তের দপ্তরের যে কটি রচনায় লেখক-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে 'আমার মন' তাদের অন্যতম। এই ধরনের রচনায় বিষয়বস্তুর উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। দেওয়া হয়েছে হৃদয়াবেগের ওপর। ফলে এর ভাষা কবিত্বময়, আর কবিত্বময় ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাব তেমন ভাবে প্রকাশ করা যায় না। এই কারণেই 'একা' 'একটি গীত', 'আমার দুর্গোৎসব' অথবা 'আমার মন' প্রভৃতি রচনা যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ না হয়ে, গদ্যে রচিত কবিতা হয়ে গেছে। এই সমস্ত রচনা আরম্ভ হয়েছে হালকাভাবে, কিন্তু ক্রমশই সেগুলি গভীর হয়ে উঠেছে। কমলাকান্তের হৃদয়ের ক্ষোভ, উচ্ছ্বাস অথবা জীবনসত্যের উপলব্ধি এদের মধ্যে প্রতিফলিত। তাই 'আমার মন' জাতীয় প্রবন্ধের জাত আলাদা। বিষয়ের অনুসন্ধানের থেকে হৃদয়ের অনুসন্ধান যেখানে বড় সেখানে গীতিধর্মিতাই যে প্রাধান্য পারে তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। গীতিকবিতায় যেমন মানবহৃদয় প্রাধান্য পায়, 'আমার মন' প্রবন্ধেও ঠিক তাই ঘটেছে।

হিউমারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'humorist দার্শনিকের নিকট আত্মীয় ও সহকর্মী।' জগৎ ও জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানই দার্শনিকের প্রধান কাজ। মানবজন্মের সার্থকতা কি—এ প্রশ্নও দার্শনিকের মনেই ওঠে। 'আমার মন' প্রবন্ধের কমলাকান্ত প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক। 'আমার মন কোথায় গেল ? কে লইল ?'—কমলাকান্তের এই আর্তজিজ্ঞাসা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকেরই জিজ্ঞাসা। এখানে "আমি" কমলাকান্ত নিজে নয়, সে আধুনিককালের আত্মসর্বস্ব সংসারী মানুষ। এরা সর্বদা নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে। চারপাশের লোকজনের ভালোমন্দ সম্পর্কে সর্বদাই নিস্পৃহ তাই এক অর্থে এরা সম্পূর্ণ হৃদয়হীন। সমস্ত প্রবন্ধটি জুড়েই পরিহাসচ্ছলে কমলাকান্ত আধুনিক

যুগের এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। এরা নিজেদের সুখী বলে মনে করে। কিন্তু তাদের ধারণা যে কত ভ্রান্ত কমলাকান্ত তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। পরের জন্য আত্মবিসর্জন ছাড়া স্থায়ী সুখের অন্য কোন উপায় নেই—এই হচ্ছে কমলাকান্তের জীবনদর্শন। বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের দ্বারাই যে এই দার্শনিক চিন্তা প্রভাবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে 'লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই', কমলাকান্তের এই মন্তব্যটিও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। "লঘুচেতা" বলতে কমলাকান্ত আধুনিক যুগের অর্থ-লোভী ও অগভীর জীবনদর্শনের অনুরাগী মানুষদেরই বুঝিয়েছেন। মনের গভীরতা এবং মানব-প্রীতির ওপর বঙ্কিমচন্দ্র বেশি জোর দিতেন। হাল্কা মানসিকতা-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে মানবজীবনের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অপর মানুষের সুখ-দুঃখ অনুভব করার মত মনও তাদের নেই। যেখানে মানুষে মানুষে সখ্য আছে, পরস্পরের প্রতি প্রীতি আছে—সেখানেই সংসার সুখের। অথচ কমলাকান্তের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে কোনো মানুষই অন্যের কথা ভাবে না, নিজের উদরপূর্তির জন্যই সবাই ব্যস্ত। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, কলকারখানার সংখ্যা বেড়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানেও মানুষের অনেক উন্নতি হয়েছে—তথাপি মানুষে মানুষে দূরত্ব কেবল বেড়েই চলেছে। আসলে কেউই প্রকৃত মানবমনের অধিকারী নয়। অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই যে যথার্থ মানুষ অন্য মানুষের কথা ভাবে, অন্যের বোঝা ঘাড়ে নেয়। আর এর ফলেই মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করে। মানব সংসারে এই স্বতঃস্ফূর্ত সুখের অভাব দেখেই কমলাকান্ত এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সামগ্রিক হৃদয়হীনতার নিদর্শন লক্ষ্য করেই সে প্রত্যেককে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। সকলেই যেন, 'মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির' জন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করে।

অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঃ অলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্ন ধরণের ফল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কমলাকান্ত কিন্তু সাদা চোখে মানুষদের ফল হিসেবে দেখে নি। কেবল আফিঙের মাত্রা চড়ালেই তার মনে হয় মানুষেরা সকলেই কোনা না কোন ধরণের ফল। বিভিন্ন ফলের মধ্যে পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষেও অনেক পার্থক্য। ফল পাকলে ঝরে পড়ে, কোন কোনটি পাকার আগেই খসে পড়ে, মানুষও তেমনি সাধারণভাবে পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু কারো কারো অকালেও জীবনাবসান ঘটে। ফলের সঙ্গে মানুষের এই তুলনা কেবল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নয়, মানবচরিত্রের কঠোর সমালোচনার জন্য। কমলাকান্তের দপ্তরের মূল সুর মানবপ্রীতি, এই রচনাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সরাসরি সমালোচনায় তিক্ততাই বড় হয়ে ওঠে, তাই এখানে রূপকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রূপকের আড়ালে কিছুটা কৌতুকের সুরেই কমলাকান্ত এখানে মানবচরিত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত। কিন্তু এই আক্রমণের সময়ও কমলাকান্ত হাতে ব্যঙ্গের চাবুক তুলে নেয় নি। তার মনের কোণে কোথায় যেন অন্তত আংশিকভাবেও স্নিগ্ধ প্রসন্নতা লুকিয়ে রয়েছে। তাই তার আক্রমণে কোন শ্রেণীর মানুষই মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করবে না, বরং নিজেদের আচার-আচরণের ত্রুটি ও অসঙ্গতি দেখে সেগুলি দূর করবার জন্য সচেষ্ট হবে।

শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্ট নিজেকে নিয়েও পরিহাস করতে ছাড়েন না। কমলাকান্তের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। বঙ্কিম নিজে ছিলেন হাকিম, সমসাময়িক-কালের দেশী হাকিমেরা অনেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন, তথাপি তিনি এই শ্রেণীটিকে ছেড়ে কথা বলেন নি। তাই কমলাকান্ত হাকিমদের 'কুষ্মাণ্ড' বলে উপহাস করেছে। আবার নিজের সম্পর্কেও কমলাকান্ত নির্দয়। অন্যান্য মানুষের মধ্যে সে দোষের পাশাপাশি কিছু গুণও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে নির্মোহ, নিজেকে সে 'সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য কদর্য্য টক' বলে অভিহিত করেছে। এখানেই রচনাটির শিল্পসফলতা। অন্যদের আক্রমণ করে কমলাকান্ত যদি নিজের সম্পর্কে নীরব থাকত তাহলে তার বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হত। তাছাড়া সেক্ষেত্রে যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা ঈর্ষাই হত প্রধান। কিন্তু কমলাকান্ত সমদৃষ্টিতে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে বিচার করতে পেরেছে বলেই তার সমালোচনা যথাযথ বলে

মনে হয়। অপরদিকে বিশুদ্ধ কৌতুকের মোড়কে আক্রমণটি উপস্থাপিত হওয়ায় আক্রমণের ধার অনেকটাই ভোঁতা হয়ে যায়, হাস্যরসটিই প্রধান হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে—নেশাখোর মানুষের দেখা বা বলার মধ্যে উদ্ভট অসংলগ্নতা থাকে, কিন্তু কমলাকান্তের বর্ণনার মধ্যে অসংলগ্নতা নেই। মানবজগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার উপলব্ধির কোনটিই মিথ্যে নয়, কিন্তু সরাসরি সব কিছুকে আক্রমণ করাও তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহলে সে স্বভাবনিন্দুক বা বিদ্বেষপ্রবণ বলে গণ্য হবে। তাই সে নেশাখোরের ছদ্মবেশ ধারণ করতে চায়। কিন্তু এটা যে তার আসল চেহারা নয়, কমলাকান্তের বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। **মনুষ্যসকল ফলবিশেষ**—বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের পৃথক পৃথক স্বভাবধর্ম রয়েছে। **মায়াবৃন্তে সংসারবৃক্ষে**—বেদান্ত দর্শন অনুযায়ী দৃশ্যমান এই জগৎ মিথ্যা হলেও তা সত্যরূপে গৃহীত হয়। মায়া অর্থ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অজ্ঞানতার জন্যই দৃশ্যমান জগৎ মানুষের কাছে সত্য বলে প্রতীত হয়। বেদান্তের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই কারণেই জগৎসংসারকে মায়া বলে অভিহিত করেছিলেন। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। গাছের ফলগুলি বোঁটায় ঝুলে থাকে, তেমনি সংসাররূপ বৃক্ষে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার বৃন্তে বিভিন্ন মনুষ্যফল ঝুলে থাকে। কোনো ফল পাকার আগে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। সংসারেও কোন কোন মানুষ অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, আবার কারো কারো পরিণত বয়সে মৃত্যু হয়। **দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে**—দেবতাদের পূজায় যেমনি ফল প্রধান উপকরণ, তেমনি ব্রাহ্মণদেরও প্রিয় হল ফলাহার। এর একটি গূঢ়ার্থও আছে। যে সমস্ত মানুষ সৎকার্যে নিজেদের উৎসর্গ করে তাদের জীবন ধন্য হয়। **কতকগুলি মাকালজাতীয়**—মাকাল ফল বাইরে অত্যন্ত সুদৃশ্য কিন্তু এর শাঁস অখাদ্য। অনেক মানুষেরই বাইরের চেহারা আকর্ষণীয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা অপদার্থ। **শৃগালে খায়**—ফল মানুষের খাওয়ার জন্য, কিন্তু গাছ থেকে মাটিতে পড়ার পরই অনেক ফল শেয়ালে খেয়ে যায়। তাদের ফলজন্ম ব্যর্থ। তেমনি অনেক মানুষের জীবনও ব্যর্থ হয়ে যায়।

রচনা। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

• 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্রেণীবিচার/রোমান্সধর্মী রচনা

ইংরাজী Prose Fiction-কে স্থূলভাবে দুভাগে বিভক্ত করা যায়—Novel এবং Romance। নভেলের প্রতিশব্দ হিসাবে উপন্যাস শব্দটি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়। রোমান্সের এজাতীয় বাংলা বিকল্প প্রতিশব্দ প্রচলিত নেই। অভিধান অনুযায়ী রোমান্সকে বলা যায় 'অত্যাশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ গল্পকাহিনী'। কথাসাহিত্যের শ্রেণীনির্দেশক এই শব্দ দুটি আধুনিককালের সামগ্রী। পূর্বে এই শ্রেণীবিন্যাস যে খুব স্পষ্ট ছিল না এমন অনুমান করা যায়। কারণ, ওয়াল্টার স্কট 'Waverly Novels' নামে যে সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি আধুনিক দৃষ্টিতে রোমান্স। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেও রোমান্স সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে সকল সৃষ্টিকেই উপন্যাস বলে গ্রহণ করেছেন। আধুনিককালে, বাস্তবতার পরিমাপের ভিত্তিতে নভেল এবং রোমান্সের পার্থক্যটি কল্পিত হয়েছে।

'Encyclopaedia Britanica' গ্রন্থে রোমান্স সম্পর্কে বলা হয়েছে— "originally a composition written in 'Romance' language. ...The absence of central plot, and the prolongation rather than evolution of the story, the intermixture of the super-natural; the presence and indeed prominence of love affairs; the juxtaposition of tragic and almost farcial incident, the variety of adventure arranged rather in the fashion of a panorama than otherwise..."। অর্থাৎ রোমান্সে কেন্দ্রীয় প্লটের অভাব থাকে, গল্প বিকশিত না হয়ে সম্প্রসারিত হয়। সেখানে অতি-প্রাকৃতের মিশ্রণ ঘটে থাকে, প্রেম সম্পর্কীয় বিষয় প্রাধান্য পায়, কৌতুককর ঘটনার সন্নিকর্ষ এবং চরিত্রের দুঃসাহসিকতা এজাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই সংজ্ঞায় সকল রোমান্স সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ কালের অগ্রগতিতে রোমান্স রচনার মধ্যেও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে; এজন্য একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আলোকে রোমান্সের সঙ্গে নভেলের পার্থক্যকে

নির্ধারণ করা সহজ নয়। অনেকে এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যা 'অবাধ কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় তারই নাম রোমান্স'।* অবশ্য রোমান্সে কল্পনার প্রাধান্য থাকলেও সেখানে কাহিনীকে বাস্তবতার বিশ্বস্ত পটভূমিকায় সৃষ্টি করতে হয়। একেবারে অলৌকিক এবং অসম্ভব ঘটনা রোমান্স নয়। রূপকথা বা অসম্ভব অলৌকিক কাহিনীকে রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করা হয় না। একটি উপন্যাসের বাস্তবতায় যে খর উজ্জ্বলতাকে লক্ষ্য করা যায় তা রোমান্সে অনুপস্থিত থাকে। যে আখ্যায়িকায় বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নিবিড় তাই নভেল। সমকালের জীবনের সামাজিক-পারিবারিক-মনস্তাত্ত্বিক অথবা এজাতীয় কোন প্রসঙ্গের বিশ্বাসযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ নভেলে স্থান পায়। নভেলের ঘটনাধারা যুক্তি বুদ্ধির সুনিপুণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। ফলে পাঠকের বিশ্বাসবোধ কোনক্রমেই আহত হয় না। কিন্তু রোমান্সের বাস্তবতা মিশ্র ধরনের। রোমান্সের চরিত্রগুলির জীবনের সুর উঁচু তারে বাঁধা, তাঁরা যে কোন কর্ম সমাপনে সক্ষম। পরিচিত জগতের সীমায় নভেল-লেখককে আবদ্ধ থাকতে হয় বলে সেখানে অসাধারণত্ব প্রকাশের অবকাশ কম থাকে। অন্যদিকে রোমান্সে প্রাত্যহিকতার সীমার এই বন্ধন থাকে না বলেই সেখানে জীবনের বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তগুলি প্রাধান্য পায়, রচিত হয় এক অপরিচিত বিস্ময়ের জগৎ। এজন্যই রোমান্স-লেখক সমকালীন বাস্তবের বদলে, দূরবর্তী অতীতের পটভূমিকা ব্যবহারে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

নভেল এবং রোমান্সের মৌলিক পার্থক্যটি সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"প্রধানতঃ উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব-গুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া। 'Novel' অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব, ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন-চিত্রণ; সত্য-পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়, কেবল আমাদের জীবন-প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই রহস্যমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শ লাভ করিতে পারে। 'Romance'-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝংকারগুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু। সেইজন্য সূর্যালোক-দীপ্ত, অতি-পরিচিত বর্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা। অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘুমেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন।"** এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে নভেল বাস্তবানুগামী হলেও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে সেখানে কখনও কখনও আকস্মিক, অসম্ভব ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু এই সংস্থাপন প্রয়োগগত কুশলতার কারণে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। রোমান্সের

মধ্যে বাস্তব জীবনের এই সম্পর্কটি লক্ষ্যগোচর হয়। তবে নভেলের মত এই যুক্তিশৃঙ্খলের গ্রন্থিটি নিবিড় নয়, অনেকটাই শিথিল। রোমান্সেও অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিককে বিশ্বাসযোগ্যরূপেই স্থান দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমতটি এইরূপ—"রোমান্স-লেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করিতে হয়, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়, ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে।"*

'কপালকুণ্ডলা'র ঘটনাকাল গ্রন্থ রচনার প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের। আকবরের রাজত্বের একেবারে শেষ সময় এবং জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী পর্যায়ের কালসীমায় 'কপালকুণ্ডলা'র বিষয়বস্তু সংঘটিত। এই উপন্যাসে আকবর, জাহাঙ্গীর, নূরজাহান এবং শের আফগানের মত ঐতিহাসিক চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছেন। মোগল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের কিছু প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে গুরুত্বের সঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত জাহাঙ্গীরের বদলে রাজকুমার খসরুকে সিংহাসনে বসানোর যে ষড়যন্ত্রের তথ্য বঙ্কিমচন্দ্র পরিবেশন করেছেন তার সঙ্গে ইতিহাসের কোন বিরোধ নেই। ইতিহাসের এ সকল উপকরণ সত্ত্বেও 'কপালকুণ্ডলা' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। কারণ ইতিহাস এখানে কল্পিত কাহিনীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আগাগোড়াই নেপথ্যে থেকেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন মতিবিবির প্রয়োজনে। সংসার সম্পর্কে উদাসীন কপালকুণ্ডলার বিপরীতধর্মী এক চরিত্র প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। কপালকুণ্ডলা পরিচিত সামাজিক পরিবেশের বাইরে তান্ত্রিকের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বুকে পালিত হয়েছেন। মতিবিবিও বড় হয়েছেন বাংলার সামাজিক গণ্ডীর বহু দূরবর্তী এমন এক পরিবেশে যেখানে ভোগাকাঙ্ক্ষা ও আত্মতৃপ্তির তাগিদই সর্বাধিক। এই চরিত্রটিকে গ্রহণযোগ্য ভিত্তিভূমি দানের প্রয়োজনে লেখক দূরবর্তী ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিহাসের এই উপাদান ঐতিহাসিক রস সৃজনের প্রয়োজনে নয়, রোমান্সের রহস্যময় মায়ালোক সৃষ্টির তাগিদেই ব্যবহৃত। এজন্যই 'কপালকুণ্ডলা' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।

'কপালকুণ্ডলা'র পরিবেশ এবং চরিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবেই রোমান্সধর্মী। প্রথম খণ্ডের ঘটনাস্থল সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্য এবং বেলাভূমি। সাগরসঙ্গমে গঙ্গাসাগর প্রত্যাগত বিপদগ্রস্ত যাত্রীদের আতঙ্কের বর্ণনা দিয়ে কাহিনীর যাত্রা শুরু। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির ঘটনাস্থল 'উপকূলে', 'বিজনে', 'স্তূপশিখরে', 'সমুদ্রতটে'র মত স্থানে। প্রথম খণ্ডের ঘটনাগুলির অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে শুধু অপরিচিত পরিবেশে নয়, কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে কিংবা রাত্রির অন্ধকারে। দিবালোকের প্রসঙ্গ তুলনামূলকভাবে কম। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক পাঠককে নিয়ে এসেছেন 'লোকালয়ে', 'রাজপথে', 'পান্থনিবাসে' কিংবা 'স্বদেশে'র মত স্থানে। দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাকালেও রাত্রি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের সাক্ষাৎ,

* প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫

কপালকুণ্ডলা-মতিবিবির প্রাথমিক পরিচয়—এসবই ঘটেছে দিবাবসানের পর এক রহস্যঘন পরিস্থিতিতে। তৃতীয় খণ্ডে লেখক পাঠককে নিয়ে গেছেন ভূতপূর্বের ইতিহাসের রাজনিকেতনে। এ সময়ের ঘটনাধারায় রাত্রির ভূমিকা ক্ষুণ্ণ হলেও ইতিহাসের অস্পষ্টলোকে পাঠককে বিচরণ করতে হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডেও এমনই অপরিচিত পরিবেশ। চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের ঘটনাকাল প্রদোষ। অতঃপর যে পরিচ্ছেদগুলি বর্ণিত হয়েছে তার স্থান এবং কাল সম্পূর্ণভাবেই রোমান্সের মায়াঞ্জনে রঞ্জিত। সপ্তগ্রামের গৃহস্থ নবকুমারের বাড়ির সংলগ্ন স্থানে সকল ঘটনা সংঘটিত হলেও সেই পরিবেশ অপরিচিত এবং ঘটনাকালেও পুনরায় রাত্রির ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। এখানেও নবকুমারের গৃহ সংলগ্ন নিবিড় বনে কিংবা বনমধ্যে নির্জন পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাকারে অথবা নদী-তীরবর্তী তটভূমিতে ঘটনাগুলি ঘটেছে। অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সপ্রযত্নে এমন এক অপরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা নভেলের উপযোগী নয়, একান্তভাবেই তা রোমান্সধর্মী।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। গল্পের মূল অবলম্বন নায়িকা কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের দৃষ্টিতে লেখক পাঠকের সম্মুখে কপালকুণ্ডলাকে উপস্থাপন করেছেন এক বিস্ময়মুগ্ধতায়—"অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।" দেখে নবকুমারের মনে হয়েছিল—"এ কি দেবী—না মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র"। বাস্তবিক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই মায়া-মোহ নিয়েই কপালকুণ্ডলা উপস্থাপিত। প্রকৃতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার এক সার্থক রোমাণ্টিক প্রতিমূর্তি কপালকুণ্ডলা। শৈশবে তিনি জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়েছেন, বড় হয়েছেন কাপালিকের মত এক ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষের সাহচর্যে, তাঁর চিত্তবৃত্তি বিকশিত হয়েছে প্রকৃতির ব্যাপ্তি এবং উদারতায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলা শুধু নবকুমার নয়, পাঠকেরও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছেন। প্রতিনায়িকা মতিবিবি সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায়। মতিবিবি যে শুধু রূপেগুণে অদ্বিতীয়া এমন নয়, তাঁর কার্যাবলী সাধারণ বঙ্গললনার তো দূরের কথা, সক্ষম সাহসী পুরুষের পক্ষেও অসম্ভব। ইতিহাসের রসে পরিবর্ধিত এই রমণী এক কথায় অসাধারণ। বর্ধমান, উড়িষ্যা কিংবা দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুর সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি, জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস সাফল্য। এই দুই রমণী চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অপর একটি চরিত্রকে, তিনি কাপালিক। তন্ত্রসাধনা, কাপালিক প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে একটি রহস্যময় ধারণা বিরাজ করে থাকে। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই মানসিকতাকে সফল ভাবেই ব্যবহার করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে বলা যায়—"কাপালিকের নির্মম ধর্ম-সাধনা—কেবলমাত্র একটা বাহ্যবৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটি গভীর, অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে।"*

* 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃঃ ৭১

নদীস্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ বিষয় পরিকল্পনা, উপন্যাসের পরিবেশ ও পটভূমিকা, চরিত্রচিত্রণ, সর্ববিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে এক অপরিচিত মায়ালোকে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনাধারাকে তিনি বর্ণনা করেছেন এমনভাবে যার মধ্যে সূক্ষ্ম যুক্তির বন্ধনগ্রন্থি থাকলেও সেই সূত্রের শক্তিটি দৃঢ় নয়। অনেক ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ আছে ; যার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন লেখক অনুভব করেন নি। সর্বোপরি, উপন্যাসের প্রদর্শিত মর্মবাণীটি সাধারণ আটপৌরে জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়, তা পরিপূর্ণভাবেই অপরিচিত এবং অতিরঞ্জিত। এই ভাবকল্পনাকে পরিবেশন করা হয়েছে উপযুক্ত ভাষা এবং গাম্ভীর্যময় বর্ণনারীতির সহায়তায়। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি এমন এক রসনিষ্পত্তিতে উপনীত হয় যা বস্তুরসপ্রধান নভেলের একেবারে ভিন্নগোত্রীয়। রোমাণ্টিকতার ভাবমাধুর্যে সম্পৃক্ত এই বাতাবরণটি একান্তভাবেই রোমান্সের উপযোগী। এজন্যই 'কপালকুণ্ডলা'কে নভেল না বলে রোমান্স বলাই যুক্তিযুক্ত।

তিতাস একটি নদীর নাম বিশ্লেষণ আলোচনা-

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যে 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব নিদর্শন। কুমিল্লা জেলার এক নদী তিতাস। গঙ্গা-পদ্মা বা মেঘনার মত তিতাস কোন কুলিন নদী নয়, তিতাসের পারে বাস করে যেসব মানুষ তারাও অতিসাধারণ। প্রধানত মৎস্যশিকার এবং কৃষিকর্ম তিতাসপারের হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবিকা। এদের মধ্যে প্রধানত মৎস্যজীবী মানুষের জীবনবৃত্তান্তকে প্রাধান্য নিয়ে লেখক নির্মাণ করেছেন 'তিতাস একটি নদীর নামে'র আখ্যানবৃত্ত। তিতাস পারের এই ধীবর সমাজ মালো নামে পরিচিত। শুকদেবপুরের মোড়লের কাছে কিশোর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মূল্যব্রহ্মণ শব্দটি ব্যবহার করেছিল। শিষ্ট বাংলায় এই মূল্যব্রহ্মণই হল মল্লবর্মণ যা থেকে মালো শব্দটির উদ্ভব। লেখক স্বয়ং মল্লবর্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। তিতাসপারের মানুষ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিতাস নির্ভর জনসমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচিত্র রূপায়ণ করেছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন সংকট, প্রেম সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব, বিশেষ কোন সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার রূপায়ণ লেখকের অভিপ্রায় ছিল না। মালোদের সামগ্রিক জীবনচর্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতির বিশদ ও বিশ্বস্ত লেখচিত্র অঙ্কন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রবহমান কালের ধারায় কিভাবে মালোদের জীবন ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে, তাদের সুখের দিন কিভাবে কেটেছে, কিভাবে নেমে এসেছে দুঃখের বিষাদময় অন্ধকার তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ আছে এই উপন্যাসে। তিতাসের মালোদের জীবনের প্রাণছন্দটি বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ তিতাসের শুকিয়ে যাওয়া। একই সঙ্গে ধীবর সমাজের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল নানাবিধ অবক্ষয়। বাইরের সংস্কৃতির চুঁইয়ে পড়া বিষাক্ত রসে মালোসমাজে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। তিতাসের মৎস্যজীবীদের এই দুই ভিন্নধর্মী জীবনস্রোতের সামগ্রিক রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক গল্পের পটভূমি ও পরিধিকে যেমন যথাসম্ভব প্রসারিত করেছেন, তেমন সঙ্কুচিত করেছেন ব্যক্তিবিশেষের জীবন ইতিহাসকে। জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা প্রসঙ্গের বিবরণ দিয়ে লেখক সমষ্টি জীবনের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন।

প্রচলিত উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনার সঙ্গে তিতাসের বিষয়বিন্যাসের রয়েছে বিরাট পার্থক্য। সাধারণত একটি উপন্যাসে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত সংহত কাহিনী থাকে। এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে এক বা একাধিক চরিত্র। কাহিনী এবং চরিত্র এ দুয়ের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিকতর এ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে চরিত্রকে নির্ভর করেই কাহিনী বিকশিত হয়। যে পুরুষ চরিত্র কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করে,যাকে অবলম্বন করে লেখকের অভিপ্রেত জীবনদর্শন অভিব্যক্ত হয়, সকল ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে যে চরিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক সর্বাধিক, তাকেই নায়কের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। জটিল কাহিনী বিন্যাসে অথবা একই ঘটনাবর্তে একাধিক পুরুষ চরিত্রের প্রায় সমপরিমাণ ভূমিকা থাকলে নায়ক বিচারে অনেক সময় বির্তক দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রেও বিতর্কিত চরিত্রগুলি উপন্যাসের ঘটনাক্রমে পূর্বাপর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তিতাসে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন চরিত্রের একক আধিপত্য নেই। প্রথম পর্বে কিশোর ও সুবল, দ্বিতীয় পর্বে বাসন্তী এবং অনন্তর মা, তৃতীয় পর্বে অনন্ত এবং শেষ পর্বে সামগ্রিকভাবে মালো-সমাজ প্রাধান্য পেয়েছে। চারটি পর্যায়েই উপস্থিত থাকলেও অধিকাংশ অংশে বাসন্তী নিষ্প্রভ। আর অনন্ত স্থান পেয়েছে তিন

পর্বের ছটি অধ্যায়ে। কোন কোন অংশে অন্য চরিত্রের পাশে অনন্ত ম্লান। স্বভাবতই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্ধারণ অথবা নায়ক বিচারের কাজটি কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করে।

'তিতাস একটি নদীর নাম'—উপন্যাসের নায়ক বিচারে সমস্যার কারণ কী, সে সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকেরা বিভিন্ন সময়ে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত উল্লেখ করা যায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'উহার ঘটনাবিন্যাস এককেন্দ্রিক নহে, বহুস্তর বিভক্ত; উহার প্রধান চরিত্রসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন। উহার ঘটনা পরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একভাবসূত্র গ্রথিত আখ্যানের যোগফল, কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে। প্রথম খণ্ডে কিশোর ও সুবল। দ্বিতীয় খণ্ডে উহাদের পত্নীদ্বয়, তৃতীয় খণ্ডে অনন্ত ও উদয়তারা ও চতুর্থ খণ্ডে মালো সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কাহিনী পর্যায়ক্রমে উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে নানা গৌণ চরিত্র, বহুবিধ সরস সমাজচিত্র, নদীযাত্রা ও নদীতীরস্থিত গ্রামগুলির বর্ণনা সমস্ত উপন্যাসটিকে প্রাণ সমৃদ্ধ ও গতিবেগ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এখানে কোন চরিত্রই কেন্দ্রীয় তাৎপর্য-বিশিষ্ট নহে; অনন্ত কিছু সময়ের জন্য উপন্যাসের মর্মবাণীদ্যোতক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, একট বিশেষ সম্প্রদায়ের মিলিত সমষ্টিগত জীবনাবেগই উপন্যাসের আসল রসকেন্দ্র। ...কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এই সমষ্টি জীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।" অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হল—'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্য উপন্যাসের মতো সন্ধান করতে যাওয়া সঙ্গত নয়। এই উপন্যাসের খণ্ডে খণ্ডে আপাত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এক নাতি-প্রচ্ছন্ন কাহিনীস্রোত আছে—তিতাসের মতো সে কাহিনী উচ্চকণ্ঠ নয়।" অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ঘটনার অভাব, একভাবসূত্র বিমুক্ত অসংখ্য ঘটনার প্রাধান্য, বহু চরিত্রের সমাবেশ, সর্বোপরি 'তিতাসই নিয়ামক' হওয়ায় উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে গোষ্ঠীজীবন। এজন্যই এই উপন্যাসের নায়ক নির্ধারণে সমস্যার সূত্রপাত।

তিতাসপারের গোকন্নঘাট গ্রামে ঘটনার সূচনা হলেও ঘটনাস্থল আরও বিস্তৃত হয়েছে। তিতাসের অদূরবর্তী বিজয় নদী, তার পার্শ্ববর্তী মালোদের গ্রাম শুকদেবপুর, উজানিনগর, এরকম আরও স্থানকে অবলম্বন করে বিবিধ জীবনচিত্র তুলে ধরার পর লেখক কিশোরের বিবাহ এবং বিপর্যয়ের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। নববধূকে নিয়ে গৃহে ফেরার পথেই ডাকাতের আক্রমণে পত্নী এবং উপার্জিত অর্থ হারিয়ে কিশোর পাগল হয়ে যায়। চার বছর পরে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী। উন্মাদ কিশোরকে নিয়ে তার বৃদ্ধ পিতামাতা বিপর্যস্ত। এসময়েই গোকন্নঘাটে অনন্ত এবং অনন্তর মার প্রবেশ। অনন্ত তখন চার বছররের বালক। কিশোরের সঙ্গে পত্নী ও পুত্রের মিলন হলেও অপরিচয়ের ব্যবধান তাদের সম্পর্ককে নিবিড় করতে দেয়নি। একাজে যারা সাহায্য করতে পারত কিশোরের প্রবাসযাত্রার দুই সঙ্গী সুবল এবং তিলক ইতিপূর্বেই প্রাণ হারিয়েছে। এই খণ্ডে একটি বিশেষ ক্ষণে কিশোরের স্মৃতি ফিরে আসার ইঙ্গিত আছে। আবেগতাড়িত অবস্থায় অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সে অনন্তর মাকে জড়িয়ে ধরে। অতীত ইতিহাস জানা না থাকায় গ্রামবাসীরা অনন্তর মার প্রতি আচরণকে অশালীন মনে করে কিশোরকে নির্মমভাবে প্রহার করে। ফলে কিশোরের মৃত্যু হয়। এর চারদিন বাদে অনন্তের মাও মারা যায়। তৃতীয় পর্ব অনন্তের বড় হওয়ার কাহিনী। অনন্তের জীবন-বিকাশের কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে বাসন্তী, উদয়তারা, বনমালী এবং সাদকপুরের কৃষক কাদির ও আরো অনেকে। বাসন্তীর স্নেহ এবং আশ্রয়ে অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হলেও অনন্তকে নিয়ে বাসন্তীর সঙ্গে তার মায়ের তীব্র কলহের পরিণতিতে বাসন্তী অনন্তকে তিরস্কার করে। ফলস্বরূপ অনন্তের গৃহত্যাগ ও উদয়তারার আশ্রয়লাভ। উদয়তারাই অনন্তকে নিয়ে গিয়েছিল তার পিতৃগৃহ সাদকপুরে, যেখানে অনন্ত নতুন আশ্রয় পায়। অনন্তবালার আবির্ভাবে উপন্যাসের মধ্যে একটি প্রণয় উপাখ্যানের উন্মেষ ঘটল। প্রথম অংশে কিশোর, বাসন্তী, সুবলাকে এবং অতঃপর অনন্তর মা ও কিশোরকে ঘিরে যে প্রণয়কাহিনী স্থান পেয়েছিল বাসন্তী বাদে অপর তিনচরিত্রের মৃত্যুতে ইতিপূর্বেই তার সমাপ্তি ঘটে। উপন্যাসের শেষাংশে অনন্তবালার প্রসঙ্গ এনে বৃত্তিজীবনভিত্তিক এই আঞ্চলিক উপন্যাসে হৃদয় জটিলতাকে নতুন করে সৃষ্টি করা হল। যদিও প্রসঙ্গটি পূর্ণতা পায়নি। চতুর্থ পর্বে প্রাধান্য পেল সমাজ ও সংস্কৃতি। এই পর্বে দুটি অধ্যায়ে অনন্ত থাকলেও তাতে অতিক্রম করে প্রাধান্য পেল মালোদের সমাজ ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ। এ অংশে বাসন্তীও ফিরে এসেছে। প্রথম পর্বের সূচনায় মালোসমাজের যে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র ছিল, তারই দুঃখজনক পরিণতি এবং সেই পরিণতির কারণ আলোচ্য পর্বের মূল কথা। তাই ব্যক্তিজীবন এখানে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

পর্বের ছটি অধ্যায়ে। কোন কোন অংশে অন্য চরিত্রের পাশে অনন্ত ম্লান। স্বভাবতই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্ধারণ অথবা নায়ক বিচারের কাজটি কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করে।

'তিতাস একটি নদীর নাম'—উপন্যাসের নায়ক বিচারে সমস্যার কারণ কী, সে সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকেরা বিভিন্ন সময়ে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত উল্লেখ করা যায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"উহার ঘটনাবিন্যাস এককেন্দ্রিক নহে, বহুস্তর বিভক্ত; উহার প্রধান চরিত্রসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন। উহার ঘটনা পরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একভাবসূত্র গ্রথিত আখ্যানের যোগফল, কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে। প্রথম খণ্ডে কিশোর ও সুবল। দ্বিতীয় খণ্ডে উহাদের পত্নীদ্বয়, তৃতীয় খণ্ডে অনন্ত ও উদয়তারা ও চতুর্থ খণ্ডে মালো সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কাহিনী পর্যায়ক্রমে উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে নানা গৌণ চরিত্র, বহুবিধ সরস সমাজচিত্র, নদীযাত্রা ও নদীতীরস্থিত গ্রামগুলির বর্ণনা সমস্ত উপন্যাসটিকে প্রাণ সমৃদ্ধ ও গতিবেগ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এখানে কোন চরিত্রই কেন্দ্রীয় তাৎপর্য-বিশিষ্ট নহে; অনন্ত কিছু সময়ের জন্য উপন্যাসের মর্মবাণীদ্যোতক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, একট বিশেষ সম্প্রদায়ের মিলিত সমষ্টিগত জীবনাবেগই উপন্যাসের আসল রসকেন্দ্র। ...কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এই সমষ্টি জীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।" অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হল—"তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্য উপন্যাসের মতো সন্ধান করতে যাওয়া সঙ্গত নয়। এই উপন্যাসের খণ্ডে খণ্ডে আপাত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এক নাতি-প্রচ্ছন্ন কাহিনীস্রোত আছে—তিতাসের মতো সে কাহিনী উচ্চকণ্ঠ নয়।" অর্থাৎ এককেন্দ্রিক ঘটনার অভাব, একভাবসূত্র বিমুক্ত অসংখ্য ঘটনার প্রাধান্য, বহু চরিত্রের সমাবেশ, সর্বোপরি 'তিতাসই নিয়ামক' হওয়ায় উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে গোষ্ঠীজীবন। এজন্যই এই উপন্যাসের নায়ক নির্ধারণে সমস্যার সূত্রপাত।

১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ত্রি.বি.—২০১১)

অথবা, আদি মধ্যযুগের বাংলার নিদর্শনটির নাম উল্লেখ করো এবং কাব্যটি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

❖ **উত্তর** ঃ আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নামে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। পরে ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। আর এই কাব্যের কবির নাম বড়ুচণ্ডীদাস। কাব্যটি প্রকাশের পর কবির পরিচয় নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়। কারণ এই কাব্যের কবি বড়ুচণ্ডীদাসের নামে আরেকজন পদাবলীর চণ্ডীদাস রয়েছেন বলে জানা যায়। চণ্ডীদাস রচনা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী আর বড়ুচণ্ডী দাস রচনা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে কাহিনী কাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে দেখা যায় গোলকের বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে এবং লক্ষ্মীর রাধা চন্দ্রাবলী নামে জন্মগ্রহণ এবং তাদের লীলা কথাটি এই কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। এই জন্মে আয়ান ঘোষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। দাসী বড়াই এর মুখে রাধার পরিচয় শুনে কৃষ্ণ তাকে চিনতে পারল এবং তিনি রাধাকে তার পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু কূলবধূ রাধা কিছুতেই কৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করতে চান না। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো এবং তিনিই কৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারলেন। নাটকীয়তা এবং কাব্যগুণে গ্রন্থটি আকর্ষনীয়। একমাত্র কৃষ্ণচরিত্র বাদ দিলে অন্যান্য চরিত্র অঙ্কনে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাব, ভাষাচরিত্র রূপায়নে, নাটকীয়তা ইত্যাদি মিলিয়ে বড়ুচণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবেই পরিচিত। আর মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত।

◆ **সমাজ চিত্র ঃ** বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রধান চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই। চরিত্রাঙ্কনে বড়ুচণ্ডীদাসকে নিপুনভাবে কাব্যটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে তৎকালীন সমাজচিত্র নির্মানেও কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই এই তিনের কথোপকথনের মাধ্যমে কবি তৎকালীন সমাজের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যের মূল চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। মঙ্গালকাব্যে যেমন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য গান করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কিন্তু সেরকম কোন মাহাত্ম্য রচিত হয়নি হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রনয় লীলার মহিমাপ্রধান চিত্র। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সমাজ চিত্র চর্যাপদের মত তৎকালীন সমাজের খুব একটা বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ পুরান এবং লৌকিক কাব্য ধারা উভয়ের সংমিশ্রণে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। কোন কোন সমালোচক শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের অনাবৃত অশ্লীলতা দেখে গ্রন্থটি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। কেউ কেউ এখানে বর্ণিত কাহিনী থেকে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের যে সমাজ তার মতই প্রাচীন বাংলার সমাজ ছিল। কিন্তু এমন অনুমান করাটা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে বাংলার সাধারণ সমাজের চিত্র সাধারণ দৃশ্যটি ফুটে উঠেছে। তবে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে আদি রসের বহুল ব্যবহার দেখা গেছে।

বর্তমান যুগেও আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে আদিরসাত্মক বর্ণনাকে হয়তবা ভাবতে শিখেছি কিন্তু আমাদের দেশে আদি রসকে ভক্তিরসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হতো। আবার বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা লীলা বিষয়ক গ্রাম্য সাধারণ কাহিনীকেই অসাধারণ রূপ দান করেছেন। সুতরাং সেই গ্রাম্য সমাজ এবং সামাজিক চিত্র যে বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যে থাকবে তা নিশ্চিৎ। সুতরাং রাধা-কৃষ্ণের আদি রসাত্মক প্রেমলীলাময় কাহিনী হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি বিশেষ সমাদর যোগ্য।

১) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীদের গদ্য রচনার পরিচয় দাও। তাঁদের মধ্যে কাকে, কেন, শ্রেষ্ঠ বলে তোমার মনে হয়।

অথবা, বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলা গদ্যের উন্মেষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা কি? লেখকদের গদ্য রচনার পরিচয় দাও।

❖ **উত্তর** ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য ইংরেজ ও বাঙালী মনীষীদের সহযোগিতায় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল এদেশে আগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশের রীতি-নীতি এবং ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা দান। এককভাবে ইংরেজ বা বাঙালী কারও পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। বাস্তবিক প্রয়োজনেই দুই সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

শ্রীরামপুর থেকে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের পর বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ

ইংরেজ রূপে উইলিয়াম কেরীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তাঁর নবগঠিত কলেজে উইলিয়াম কেরিকে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি কয়েকজন পণ্ডিত মুন্সী নিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি নিজে দু'খানি বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটিতে একত্রিশটি অধ্যায়ে মজুর, ঘটক, জমিদার, রায়ত, মেয়েলি কোন্দল, হাট ইত্যাদি প্রসঙ্গো কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে দক্ষতার সঙ্গো নানা গল্প কাহিনী পরিবেশিত। পরিচ্ছন্ন ভাষা, প্রচলিত শব্দ, চমৎকার অন্বয় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

কেরিসাহেব সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে উপযুক্ত ভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রচনার জন্য একটি শক্তিশালী অধ্যাপক লেখক গোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি কলেজের বাঙলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজে। এছাড়াও অধ্যাপনার জন্য আটজন পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেন। কলেজের পঠন পাঠনের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন পরে এবং এই কলেজ থেকে উল্লেখযোগ্য লেখকের গ্রন্থের পরিচয় এভাবে দেওয়া যেতে পারে—

রামরাম বসু ঃ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঃ বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধ চন্দ্রিকা (১৮২২) (অনুমানিক।)

গোলকনাথ শর্মা ঃ হিতোপদেশ (১৮০২)।

চণ্ডীচরণ মুন্সী ঃ তোতাইতিহাস (১৮০৫)

রাজীব লোচন মুখ্যোপাধ্যায় ঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৪)।

হরপ্রসাদ রায় ঃ পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

উইলিয়াম কেরী ঃ কথোপকথন (১৮০১) ইতিহাস মালা (১৮১২)

গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে লেখকবৃন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে গদ্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন।

কেরির কথোপকথন এবং রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র কথ্যরীতি অনুসরণে লেখা। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙালী রচিত মৌলিক গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু কথ্য ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সংস্কৃতের শব্দসম্পদের সামঞ্জস্য পূর্ণ প্রয়োগে পরিচ্ছন্ন গদশৈলী নির্মানের মতো প্রতিভা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের ছিল না।

লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জর বিদ্যালঙ্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তদানীন্তন বিজ্ঞসমাজে হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'র ভাষায় বলা যায়— 'একাধিক

বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার কৌতূহলের ব্যাপকতা ও সাহিত্যকৃত্যের নানামুখিতার পরিচয় দিয়েছেন। দুইখানি অনুবাদ গ্রন্থ, একখানি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, একখানি বিবিধবিদ্যাসম্বন্ধীয় ও মুখ্যত দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি যে কেবল ফরমায়েসী লেখক নহেন ও তাঁহার মনন-শক্তি যে বিচিত্র পথগামী তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র লেখক যিনি বিষয় দ্বারা অভিভূত না হইয়া বরং নানা বিষয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের শক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গদ্যভাষার মধ্যেও বিষয়োপযোগী প্রয়োগ কুশলতা ও বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া নতুন পথে পদক্ষেপ ও নব পরীক্ষার সাহসিকতা দেখা যায়। ..... মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সচেতন শিল্পীমন ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ লইয়া গদ্য নির্মিতির ভিত্তি রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। ..... তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহ্যহীন, অপাংক্তেয় ক্রমে বাঙলা গদ্যের মধ্যেও কিছু মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দস্পন্দের একটা ক্ষীণ আভাষ প্রবর্তন করিয়াছেন।'

পরিশেষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চা সম্পর্কে আর একটি কথা এই যে, এখানকার লেখকরা কলেজের ছাত্রদের জন্যই গ্রন্থ রচনা করতেন, বাইরের জনসমাজের সঙ্গে এসব রচনার বিশেষ যোগ ছিল না। সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতার সংস্পর্শেই সাহিত্যকর্মীদের মমন চিন্তনে সচেতনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। বৃহত্তর সমাজ পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কহীন লেখকগোষ্ঠীর মৌলিক চিন্তা ভাবনার কোন্ উদ্দীপনা ছিল না। লেখক হিসাবে সাবলম্বী না হলেও এদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাই বাংলা গদ্যচর্চা ও বাংলা গদ্যের উন্মেষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান ব্যাপক।